প্রথম অধ্যায়
আশাপূর্ণাদেবীর ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য জীবন

"কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে" — কবি একথা বললেও মনে রাখতে হবে কবি বা সাহিত্যিক কোনো ভুঁইফোড় মানুষ নন এবং তাঁর সৃষ্টিও শুধুমাত্র কল্পনার বিলাস নয়। তিনি যে পরিবারে, পরিবেশে, সমাজে বেড়ে ওঠেন তা যেমন তাঁকে গঠন করে, তেমনি গড়ে তোলে তাঁর সৃষ্টিকে, জীবনবোধকে, শিল্পী মানসকে। আশাপূর্ণাদেবীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাই প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর মত সূচনায় আশাপূর্ণাদেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

সময়টা ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী (বাংলা ২৪ পৌষ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) শুক্রবার সকাল, উত্তর কলকাতার মামার বাড়িতে জন্ম নিলেন ভবিষ্যতের এক বিরল প্রতিভা আশাপূর্ণাদেবী।

বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন শিল্পী মানুষ, গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রথম যুগের ছাত্র। তিনি বিখ্যাত সি. ল্যাজারাস কোম্পানীর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন। ছবি আঁকা ছাড়াও মাছ ধরা, গান গাওয়া, স্বাস্থ্য চর্চা, বাজি বানানো, তাসখেলা, ঘর সাজানো, নিজেকে সাজানো ইত্যাদি ছিল তাঁর হাজার রকমের সখ। তিনি বাড়িতে টাকাপয়সা যোগাতেন আর নিজের সখ নিয়ে থাকতেন। অত্যন্ত রাজভক্তও ছিলেন তিনি। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। এছাড়া "মানসী" ও "মর্মবাণী" পত্রিকা-তেও তিনি ছবি আঁকতেন।

মা সরলাসুন্দরী দেবীর একমাত্র নেশা ছিল সাহিত্য পাঠ। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর। শুধুমাত্র বই পড়ার জন্য তিনি আলাদা করে সংসার পেতেছিলেন। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন স্বদেশী। বাড়িতে এই দুই বিপরীত আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন আশাপূর্ণাদেবী এবং তাঁর ভাইবোনেরা।

আশাপূর্ণাদেবীরা ছিলেন নয় ভাই-বোন — পাঁচ বোন, চার ভাই। স্নেহলতা, বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, রত্নমালা, আশাপূর্ণা, সম্পূর্ণা, হীরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং লেখা।

আশাপূর্ণাদেবী ছিলেন বাবা-মা-র পঞ্চম সন্তান। একদম বড় দিদি-র অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কার্সিয়াঙে। তিনি বিশেষ এসে উঠতে পারতেন না। আগের দিদি রত্নমালা, পরে আশাপূর্ণা, তারপরে সম্পূর্ণা — এদের মধ্যে মিল ছিল খুব। আশাপূর্ণাদেবী নিজেই জানিয়েছেন "আমরা তিন বোন ছিলাম, যেন একটি 'ট্রিলজি'র অখণ্ড সংস্করণ। এক মলাটে তিনখানি গ্রন্থ।" (পৃষ্ঠা-৩৪/আমার ছেলেবেলা—আশাপূর্ণাদেবী/আর এক আশাপূর্ণা/মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৪)।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার বেগমপুর। তবে লেখিকার ছেলেবেলার কিছুদিন কেটেছে উত্তর কলকাতার বৃন্দাবন বসু লেনে, ভাড়াবাড়িতে, একান্নবর্তী পরিবারে। আশাপূর্ণাদেবীর পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৃন্দাবন বসু লেনের একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে আপার সারকুলার রোডের ১৬৬ নম্বর বাড়িতে তাঁর পরিবার স্থানান্তরিত করেন। এটিও ছিল ভাড়া বাড়ি। বাড়িওয়ালার প্রয়োজনে এখান থেকেও তাঁদের উঠে যেতে হয়। বছর খানেক অন্য পাড়ায় বাস করে আবার তাঁরা ফিরে আসেন ১৫৭/১ নম্বর আপার সারকুলার রোডের নিজেদের নতুন বাড়িতে।

কলকাতার বৃন্দাবন বসু লেনের বাড়ি সম্পর্কে আশাপূর্ণাদেবী জানিয়েছেন — "ঠাকুমার পাঁচ ছেলে পাঁচ বৌ, ঘর পিছু অন্তত জনা পাঁচ সাত সেনাবাহিনী। এছাড়া তাঁর আট মেয়ের মধ্যে দুচারজন তো আছেনই সবসময়। তাঁদেরও সৈন্যসামন্ত। মস্ত একটি 'তুতো' সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাস।" (পৃষ্ঠা-৩১ / আমার ছেলেবেলা/ঐ) বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন মেজ ছেলে। পাঁচ বছর পর্যন্ত বাবার বাড়ি বলতে আশাপূর্ণার অভিজ্ঞতা এমনই।

ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবী ৩৮ বছর বয়সে বিধবা হন পাঁচ ছেলে ও আট মেয়ে নিয়ে, যাদের একটি তখনও জঠরে। তখন থেকেই ছাঁটা চুল, থান, নির্জলা একাদশী, নিত্য গঙ্গাস্নান ও আশি বছর বয়স পর্যন্ত গঙ্গাজল পান। তিনিই ছিলেন বিশাল পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁর সংসারে মেয়েদের বর্ণপরিচয় করানোর মত আধুনিকতার পাট ছিল না। ওসব শুধু ছেলেদের জন্য। "ছেলেদের জন্যে ইস্কুল, ছেলেদের জন্যে মাস্টার।" (পৃষ্ঠা-৩২/ঐ)

আশাপূর্ণাদেবী বলেছেন — "She was the matriarch of this large family, a Banyan tree, which sheltered all of us and I was only one leaf of this tree..... It was a very conservative household, ruled by my grandmother's iron-will. Whatever she said was

law, and every member of the family had to follow her orders. And she had a very low opinion about woman." [A Brief Encounter With Ashapurna Devi (6.2.1991) – Shivani Banerjee Chakravarty, News letter (School of Women's Studies), Jadavpur University, March 2000] এই রক্ষণশীলতা বোধ হয় নিস্তারিণী দেবীর সন্তানদের মধ্যেও চারিত হয়েছিল। তা না হলে স্বতন্ত্র বাড়িতে চলে গিয়েও কেন হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মেয়েদের স্কুলে পাঠান নি। যাই হোক, নিস্তারিণী দেবী ছিলেন দেহ-মনে অস ব শক্তিমতী। আশাপূর্ণার সৃষ্ট অনেক চরিত্রেই এই চরিত্রের ছায়া আমরা লক্ষ্য করি।

আশাপূর্ণাদেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন এক শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। সে পরিবার ছিল লেখাপড়ায় বিশেষ আগ্রহী, ইংরেজী শিক্ষায় রপ্ত ও কৃষ্টি সম্পন্ন। সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁর সাত ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, দাদা অমৃতলাল রায় ছিলেন লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক। ছোটো ভাই চুনীলাল রায় ছিলেন রাঁচি জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মেজ ভাইয়ের ছেলে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে রাঁচির কাছে 'কাঁকে'-র হসপিটালের বড় ডাক্তার হয়েছিলেন।

স্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার সৌভাগ্য আশাপূর্ণাদেবীর হয় নি। তবু নিজ চেষ্টায় আড়াই বছর বয়সেই তিনি পড়তে শিখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই শেখার সূত্র "মেজেয় মাদুর পেতে দুই দাদা তারস্বরে পড়া মুখস্থ করছেন, আর (হিসেব মতো তিন বছরের থেকেও ছোট) একটা মেয়ে তাঁদের সামনে বসে বইয়ের ওপর ঝুঁকে একবার লেখাটা দেখে নিচ্ছে, আর একবার ওই পড়ুয়াদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। উ শ্য, উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে লেখার লাইনগুলোর সামঞ্জস্য বিধান। তা সেটা হল কিন্তু ফলাফলটা অদ্ভুত। বইয়ের উল্টোদিক থেকে গড়গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে মেয়ে, বই সোজা করলেই বোবা। অর্থাৎ পুরো লেখাটা তার চোখে ধরা দেয় ফুল পাখি মাছ বা গাছ-এর ছবির মত অখন্ডভাবে। বর্ণমালার ধার না ধেরে।" (পৃষ্ঠা-৩২/আমার ছেলেবেলা / আর এক আশাপূর্ণা/ঐ)

মেয়েটার এই উল্টোপড়া নিয়ে বাড়িতে হাসির রোল পড়ে যায়। আত্মীয় স্বজন এলে তাদের ডেকে দেখানো হয়। কিন্তু আশাপূর্ণা বেশীদিন আর নিজেকে অপরের হাসির খোরাক করে রাখলেন না। দাদাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বইগুলো একবার উল্টো করে, আর একবার সোজা করে পড়ে পড়ে আয়ত্ত করে নিলেন 'সোজা পড়া'। তিন বছর বয়সে যখন

তাঁর বোন জন্মায়, তখন আঁতুড় ঘরে থাকা মা-কে দরজার বাইরে বসে বই পড়ে শোনাতেন। আর ছ-বছর বয়স থেকে তাঁর সাহিত্যপাঠ শুরু হয়ে যায় পুরোদমে। বাড়িতে ছিল প্রচুর বই। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর যাবতীয় গ্রন্থাবলী ছাড়াও আরও অনেক বই। বই আসত 'জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী', 'চৈতন্য লাইব্রেরী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে। সেই সব কিছু নির্বিচারে পড়ে যেতেন। বড়দের বই বাচ্চারা পড়ে শুনে কেউ শিউরে উঠলে মা সরলাসুন্দরী দেবী বলতেন "বই পড়ে কেউ খারাপ হয় না। জ্ঞান অবধি তো পড়ছে।" (পৃষ্ঠা-৩৬/ঐ) এতেও যদি বইয়ের টান পড়ত তবে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, কালীপ্রসন্নের মহাভারত একশোবার করে পড়তেন। বাড়িতে আসত স্টেটসম্যান, হিতবাদী পত্রিকা। সেগুলোও পড়তেন। এভাবেই তিনি স্ব-শিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত। মোটকথা বইটা তাঁর কাছে ভাতের মতই ছিল অপরিহার্য।

ছেলেবেলায় আশাপূর্ণাদেবী প্রচন্ড দুরন্ত ছিলেন। এককথায় 'ডুকাবুকো'। চলতি নাম ছিল 'দস্যি', 'পাহাড়ে', 'ডাকাত'। ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা, ক্যারাম খেলা ছিল প্রিয় খেলা। অন্যান্য প্রিয় খেলার মধ্যে ছিল মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল ও ঘরবাড়ি বানানো। বছর তিনেকের একটা পাথরকুচির মত মেয়ে, পরণে কোমরে দড়ি পরানো ঝলঝলে একটা ইজের (তার দড়িটার দুটো মুখ পায়ের কাছে লটকাচ্ছে), ধুলোয় ধূসর একমাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে, মুখে-গায়ে একগাদা ঘাম নিয়ে আর বুকের মধ্যে দুহাতে যতগুলো স ব দরকারি জিনিসপত্র আঁকড়ে একতলা থেকে ছাদ, ছাদ থেকে একতলায় যাতায়াত করছে। অস ব ব্যস্ত সে। দরকারি জিনিসের তালিকায় খালি দেশলাইয়ের খোল, খালি সিগারেটের টিন, খালি সাবানের বাক্স, পিচকিরির খালি চোং, টুকরো টুকরো কাঠ ইত্যাদি। সরঞ্জামের মধ্যে হাতুড়ি, কাটারি, পেরেক, সরু মোটা তার, কাঠের টুকরো, বিস্কুটের টিনের পাতলা টিনের শিট ইত্যাদি। বয়স অনুযায়ী সরঞ্জামের বদল ঘটেছে। এসব দিয়ে কিছু না কিছু তৈরি হচ্ছে। তাঁর এই খেলায় বিশেষ সঙ্গী জুটত না। আর তাঁর "খেলার দাপটে, আইডিনের শিশি দুচার দিনে খতম, হাত পায়ের কোনোখানে না কোনোখানে ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যান্ডেজ বাঁধাই আছে।" (পৃষ্ঠা-৩১/ঐ) এই দস্যি মেয়েকে শান্ত করার জন্য তাঁর মা তাঁকে কোনো উঁচু জায়গায় বসিয়ে দিয়ে হাতে একটা বই ধরিয়ে দিতেন। মেয়ে একেবারে শান্ত। মেয়েটির আর একটি প্রিয় খেলা ছিল কবিতা মুখস্থ করা, এই খেলাটিও তাঁর মা-ই ধরিয়ে

দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাহিত্য রুচি গড়ে দিয়েছিলেন। কাজেই তখন তাঁর কবিতা মুখস্থের চোটে এবং আওড়ানোর চোটে বাড়ির সকলে অস্থির। তবু "বই পড়াই ছিল দৈনিক জীবনের আসল কাজ"।

আশাপূর্ণাদেবী ছেলেবেলাতেই ছিলেন কলকাতার প্রেমে বিভোর। ১৬৬ নম্বর আপার সারকুলার রোডের বাড়িটির সামনে ছিল চওড়া রাস্তা। আর সেই রাস্তার ওপর বয়ে যাওয়া প্রাণের প্রবাহ সেই শৈশব থেকেই তিনি অনুভব করতেন। ছাদে উঠলেই দেখা যায় টালার ট্যাঙ্কের ঝকঝকে করোগেট চালের মাথা। বাড়ির সামনে দিয়ে যায় মহরমের তাজিয়া ভাসান। ঘোড়ায় চড়া বর, রাসপূর্ণিমার দিন পরেশরনাথ মন্দিরের মিছিল ইত্যাদি কত কি। সে কলকাতার প্রেমে না পড়ে কি শিশুমনের উপায় ছিল!

তাঁর ছেলেবেলায় কলকাতায় বাস ছিল না, রিক্সা ছিল না, ট্যাক্সির সমারোহ ছিল না, অলিতে-গলিতে মনোহর দোকান ছিল না, রেডিও ছিল না, সার্বজনীন দুর্গাপুজো ছিল না, ইলেকট্রিসিটি ছিল না, সিনেমা ছিল না। ছিল বায়োস্কোপ, হতো নির্বাক ইংরেজী ছবি। আশাপূর্ণাদেবীর বারো-তেরো বছর বয়সে বাংলা নির্বাক ছবি আসে। তবে ছিল থিয়েটার — মিনার্ভা আর ষ্টার — এ দুটোতেই জমিয়ে রাখত। বাড়িতে কেউ এলে তাকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাওয়া হত। তবে 'আর্ট' থিয়েটারের নাম তখন কেউ শোনেওনি।

আশাপূর্ণাদেবী ছেলেবেলায় শুনেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা। তবে তা সেভাবে প্রভাব ফেলে নি। শুধু শুনেছিলেন এর জন্য জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে, আর সব জিনিসের 'ট্যাক্সো' বাড়ছে। কাটা পোনার দাম চার আনা থেকে পাঁচ আনায় উঠে গিয়েছিল, হাঁসের ডিম তিন পয়সা জোড়া থেকে চার পয়সা জোড়া, চো পয়সা সের দোবরা চিনি ইত্যাদি। জলের মিটার বসেছিল। আশাপূর্ণাদেবী আরও শুনেছিলেন, ব্রিটিশ-জার্মাণ যুদ্ধের কথা। ব্রিটিশ ভক্ত বাবা চাইতেন ব্রিটিশরা জিতুক, মা চাইতেন জার্মাণরা। যুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটিশরা জিতলে তাঁর বাবা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

সেসময়ের কলকাতায় সারা দিনে কত রকমের শব্দ ধ্বনিত হত। ভোর থেকে দিনের নানা সময়ে বাজত কলের বাঁশি, শোনা যেত কেল্লার তোপ, রাত চারটে থেকে শুরু হত ঘোড়ায় টানা ময়লা গাড়ির ঝড়াং ঝড়াং শব্দ, সকালে রাস্তা ধোওয়ার হোস পাইপের শব্দ,

ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানের রোক্‌খে রোক্‌খে চীৎকার, দুপুরে ফেরিওয়ালার চীৎকার কলকাতার জীবনকে মুখর করে রাখত।

কলকাতার রাস্তায় তখন দেখা যেত পাল্‌কি। দু আনায় যাতায়াত হয়ে যেত। আশাপূর্ণাদেবীর ঠাকুমা প্রায়ই পাল্‌কি করে আসতেন যেতেন। দু-একটা হাওয়া গাড়ি (মোটর গাড়ি) চলত, চলত ঘোড়ার গাড়ি। রাস্তা মেয়ে-বর্জিত ছিল। কেননা, ভদ্র ঘরের মেয়েরা বের হত না রাস্তায়। দেখা যেত বাসনমাজুনি ঝি, চুড়িওয়ালি, ঘুঁটেওয়ালি, বাসনওয়ালি, নাপতিনী, ধোবানী — এদেরকে। হয়ত বা দু-একজন বয়স্ক গিন্নি মানুষকে গঙ্গাস্নানে যাওয়া-আসার পথে। আর দেখা যেত 'মুস্কিল আসান'-কে। টিপ্‌টিপে বুক নিয়ে আর হাতে একটা পয়সা নিয়ে দাঁড়াতে হত তার কাছে ভুষোর টিপ পরতে। না পরলে পাপ হবে যে।

আশাপূর্ণাদেবী ছেলেবেলায় দুর্গাঠাকুর দেখতে যেতেন শোভাবাজার রাজবাড়ি, শ্যামবাজার মিত্তিরবাড়ি, রাণী রাসমণির বাড়ি, পাথুরে ঘাটার মল্লিকবাড়ি ইত্যাদি পাঁচ-ছ-খানা জায়গায়। তবে পুজোর ক-দিনের মধ্যে একদিন একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মা-খুড়িমা-রা একদিনই ঠাকুর দেখতে বের হতেন সাঁটা জানলা ছ্যাকড়া গাড়িতে। কালী প্রতিমা দেখতে যাবার বালাই ছিল না। পুজোয় হত একটা ফ্রক, একটা শাড়ি। তা নিয়েই কাটাতে হত চারদিন। ১২ বছর বয়সের পর তাঁর বাইরে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, তখন তিনি বড় হয়ে গেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে আশাপূর্ণাদেবী বলেন— "আমার ছোটবেলার কলকাতা ছিল সোনার কলকাতা। উত্তর কলকাতার অনেক অঞ্চলই ছিল বলতে গেলে পাড়া গাঁ। এখানে-ওখানে ডোবা, পুকুর, কচু বন। সন্ধ্যে থেকেই শেয়ালের ক্যা-হুয়া, ক্যা-হুয়া। সকালবেলা দেখতাম আকাশে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চক্কর দিচ্ছে শঙ্খচিল। এত বিজ্‌লিবাতি, গাড়িঘোড়া তখন ছিল নাকি! রেডিও টিভি ভিডিও তো দূরের কথা, সিনেমাটিনেমাও ছিল না। থাকার মধ্যে থিয়েটার। 'স্টার', 'মিনার্ভা' এইসব। সন্ধেবেলায় বেশিরভাগ জায়গাই নিঝুম হয়ে যেত। এখন তো কথায় কথায় চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি। দিনদুপুরে মানুষ খুন হয়ে পড়ে থাকছে রাস্তায়। কেউ দেখবার নেই। আমাদের ছোটবেলায় কলকাতায় এসব ছিল না।

আমরা সাত-আটজন মেয়ে সোনার গয়নায় গা মুড়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি। কিন্তু কোনও ভয় নেই। নিরাপত্তার কোনও অভাব নেই। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করো তো। এখন মেয়েরা এভাবে বেরোতে পারবে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কলকাতা কেমন যেন একটু একটু করে শ্রী হারাতে লাগলো।" (পৃষ্ঠা-২২৭/আনন্দমেলা ১৭.০৯.১৯৮৬ সংখ্যা / সাক্ষাৎকার-শ্যামলকান্তি দাশ/উৎসঃ কোরক সাহিত্য পত্রিকা/ঐ)।

বাংলা ১৩৩১ (ইংরেজী ১৯২৪) অব্দে আশাপূর্ণার জীবনের বাঁক বদল ঘটে। কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়া নিবাসী নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরোজিনী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র বাইশ বছর বয়সী শ্রী কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে পঞ্চদশী আশাপূর্ণার বিবাহ হয় ৬ই শ্রাবণ। আশাপূর্ণাদেবী বিবাহ পূর্ব জীবনে মনে করতেন তাঁর বর যদি লাইব্রেরীয়ান হন, তবে তিনি প্রচুর বই পড়তে পারবেন। অথবা রেলে চাকরী করলেও অনেক জায়গা তিনি ঘুরতে পারবেন। না তা হয় নি। কালিদাস গুপ্ত চাকরি করতেন কলকাতায় মার্কেনটাইল ব্যাঙ্কে।

তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল যথেষ্ট রক্ষণশীল। আশাপূর্ণাদেবীর কথায় "মেয়েদের পক্ষে তো আর শ্বশুরবাড়ি জায়গাটা কুসুমকোমল নয়। তাছাড়া সে তো আবার পিতৃগৃহের 'পর্দার' থেকেও অনেক ঘোরালো। স্রেফ লৌহ যবনিকার অন্তরালে। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে ঘটেছিল মফস্বলের শ্বশুরবাড়িতে বইয়ের অভাবে। জলের মাছ ডাঙায় পড়া আর কি।" (পৃষ্ঠা-৭/খেলা থেকে লেখা - আশাপূর্ণাদেবী / আর এক আশাপূর্ণা/ঐ)। সাহিত্য পঠন-রচনার আবহাওয়া সেখানে একেবারেই ছিল না। নতুন পঞ্জিকাই ছিল সেখানে আশাপূর্ণার মানসিক জলযোগের একমাত্র উপাদান। বইয়ের অভাবে "অনেক ক্ষুধার্ত দুপুর কাটাতে হয়েছে — গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার সময় 'ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ' ও ডাকঘরের নাম ধাম মুখস্থ করে আর 'বৃহৎ বাঁধাকপি' ও 'রাক্ষুসে মূলা'র বিবরণ পড়ে।" (পৃষ্ঠা-৭-৮/ঐ) শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানত তাদের বধূ লেখে, যদিও তাঁরা বধূর লেখা সেভাবে পড়তেন না। এক সাক্ষাৎকারে আশাপূর্ণাদেবী বলেন — শাশুড়ি ছিলেন "সেকালের মানুষ, খুব আচারবিচার নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ছিল। আর ভীষণ জবরদস্ত মহিলাও ছিলেন। তবে তাঁর মনোরঞ্জন করে বাকি সময়টুকু আমি নিজের খাতে ব্যয় করলে, তাতে তাঁর কিছু এসে যেত না। ..... তিনি বলতেন 'বৌমা অত নাটক-নভেল পড় কেন, ভাল ভাল বই পড়তে পার না?

ধর্মপুস্তক। লেখও তো ওই সবই'। আমি বলতাম, সবই তো পড়ি। যা পাই তাই পড়ি। যখন কিছু পাই না, তখন পাঁজিও পড়ি। যখন তাও পাই না, তখন পুরনো বইগুলো আবার নতুন করে পড়ি। কাজেই ধর্মপুস্তক যদি হাতে আসে পড়ি তো। তবে ধর্মপুস্তক লেখা? সেটা তো আর স ব নয়।" (পৃষ্ঠা-১৯৬/দেশ পত্রিকা/২.২.১৯৯১ সাক্ষাৎকার-চিত্রা দেব/উৎসঃ কোরক সাহিত্য পত্রিকা/ঐ)। তবে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় গল্প প্রকাশের দরুণ পাঁচ টাকা পেলে শাশুড়ি সরোজিনী দেবী খুব খুশি হন এই কারণে যে বৌমা মিছি মিছি সময় নষ্ট করে না, তার লেখার একটা মূল্যও আছে। যাইহোক, শ্বশুরবাড়িতে সংসারের সব দায়িত্ব সামলে, কখনো সকালে, কখনো রাতে, কখনো বা ঘুম ভেঙে গেলে গভীর রাতেও সাহিত্য রচনা করেছেন আশাপূর্ণাদেবী।

স্বামী কালিদাস গুপ্ত চাকরি করতেন কলকাতায়, সপ্তাহান্তে একদিন বাড়ি যেতেন। যাতায়াতের কষ্ট লাঘব করার জন্য ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ভবানীপুরের রমেশ মিত্র রোডে তিনি বাড়ি ভাড়া করে মা-বাবা-স্ত্রী ও দুই ভাইকে নিয়ে আসেন। পরে সেখান থেকে ভবানীপুরেই টাউনসেন্ড রোডে উঠে যান। সেখান থেকে চলে আসেন ৭৭ বেলতলা রোডের ভাড়াবাড়িতে। সেখানে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ১৯৬০ সাল নাগাদ আশাপূর্ণাদেবী প্রায় ৫১ বছর বয়সে গোলপার্কের কাছে গভর্ণমেন্ট হাউসিং-এর চারতলার ফ্ল্যাটে স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ, দু'বছরের নাতনিকে নিয়ে নিজস্ব সংসার গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এখানেই বসবাস করে গড়িয়ার ১৭, কানুনগো পার্ক ঠিকানায় নিজের বাড়িতে স্বামী, দুই নাতনি, পুত্র, পুত্রবধূ সহ চলে আসেন।

কালিদাস গুপ্ত ছিলেন প্রকৃত অর্থেই আশাপূর্ণাদেবীর জীবনসঙ্গী। দীর্ঘ ৫৪ বছরের তাঁদের সুখী দাম্পত্য জীবন। বিয়ের পর আশাপূর্ণাদেবী মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ তার স্বামী ছিলেন নিরামিশাষী। স্বামী ছিলেন তাঁর বন্ধু, সর্বত্র তাঁর সঙ্গী। সাংসারিক রৌদ্রঝড় থেকে যেমন আশাপূর্ণাদেবীকে সযত্নে আড়াল করতেন তিনি, তেমনি জীবনের আঘাত-প্রাপ্তি — সবকিছুই তাঁরা দুজনে সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন — আশাপূর্ণাদেবীর "সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন তাঁর স্বামী। উনি মধুর, অনাবিল হেসে বলতেন — অ, মহাশ্বেতা, আমাদের দুটিতে খুব ভাব, জানলে? ছোটো বয়সে বিয়ে তো?" ('মহীয়সী' — মহাশ্বেতা দেবী / দেশ, ২৯ জুলাই

LIBRARY NBU DARJEELING

271091
07 JUN 2014

১৯৯৫) আশাপূর্ণাদেবী নিজেও জানিয়েছেন "অবশ্য আমার স্বামী খুবই উদারচিত্ত ছিলেন। কখনও কোন ব্যাপারেই বাধা দেন নি। ..... এমনকি আমার লেখা যারা ভালোবাসত এবং সেইসূত্রে আমাকেও যারা ভালোবাসত তাদেরও উনি একান্ত প্রীতির চোখে দেখতেন।" (পৃষ্ঠা-১৯৫ /'দেশ' - ২.২.১৯৯১/সাক্ষাৎকার-চিত্রা দেব/উৎসঃ কোরক সাহিত্য পত্রিকা/ঐ) আশাপূর্ণাদেবীর রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উৎসাহদাতা। রচনাপ্রার্থী হয়ে যারা আসতেন তাদের হয়ে আশাপূর্ণার কাছে তাঁর অনুরোধ ছিল "ওদের ফিরিয়ে দিয়ো না — .....।" (ভারতকথা- ১০.১২.১৯৮৬/'ঘরে বাইরে'-আশাপূর্ণাদেবী / সাক্ষাৎকারঃ আরাধনা দাশগুপ্ত)

তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল —

পাঁচ বছর বয়সে জীবনের প্রথম ভ্রমণ। সন্তানস বা সরলাসুন্দরী দেবী আশ্রয় নিয়েছিলেন রাঁচিতে মায়ের কাছে। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন আশাপূর্ণাদেবী।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি দেওয়া। 'বাড়ির কাউকে না জানিয়ে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর নামে একটি চিঠি লিখে প্রেরণ করে ফেললাম। দুই বোনের যুগল স্বাক্ষরে। বিষয়বস্তু? কিছুই না, শুধু একটি আবেদন। 'নিজের হাতে আমাদের নাম লিখে একটি উত্তর দেবেন'। ..... তারপর ঘটল সেই আশ্চর্য ঘটনাটি। শাদা শক্ত কাগজের একখানি বড়মাপের খামে চিঠি এল। স্বয়ং — রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে লিখেছেন — আমাদের মত অধম দুটো মেয়ের নাম।" (পৃষ্ঠা-৩৭/আমার ছেলেবেলা-আশাপূর্ণাদেবী/আর এক আশাপূর্ণা/ঐ)

১৫ বছর বয়সে বিবাহ।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বছর বয়সে জননী হন। ১৯২৬-২৯-এর মধ্যে তিন সন্তানের জননী হন তিনি — পুষ্পরেণু, প্রশান্ত, সুশান্ত।

আশাপূর্ণার প্রিয় শখ ছিল সাহিত্য পাঠ এবং ভ্রমণ। সেইসঙ্গে ছোটগল্প রচনাকে তিনি বলেছেন প্রথম প্রেম, আর উপন্যাস হল দ্বিতীয় ভালোবাসা।

স্বভাবের দিক থেকে আশাপূর্ণাদেবী ছিলেন অত্যন্ত সংসারী, সহজ-সরল-ঘরোয়া-দায়িত্বশীল-কর্তব্যনিষ্ঠ-পরিশ্রমী এক মানুষ। তিনি ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, উদার স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি স্বরূপ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সংসারের সব দায়িত্ব পালন করেছেন, সবার প্রতি নজর রেখেছেন। আবার চূড়ান্ত শোকেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রেখেছেন।

শোককে ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ করেছেন, হা-হুতাশ করে প্রকাশ করেন নি কারো কাছে। ভগবৎ জীবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি তাঁর ছোট মামা-শ্বশুর পূর্ণানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তখন থেকেই সেই গুরুর উপদেশে তিনি ঈশ্বরের কাছে পেয়েছিলেন আশ্রয় ও পরম নির্ভরতা এবং এর ফলে যে-কোনও সাংসারিক বিপদকেই তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

কন্যা পুষ্পরেণুকে লেখা কয়েকটি চিঠি থেকে তাঁর স্বভাবের কিছু দিক তুলে ধরা যাক। ১৪-০৪-৮২ তে পুষ্পরেণুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখছেন — "বৌমা যাচ্ছে। তার হাতে তোমার জন্যে একটি শাড়ি ও একটু সিঁদুর পাঠালাম। কাল নিশ্চয় করে পোরো। এটি স্বামী পুত্রের কল্যাণ। এই সঙ্গে কুড়িটি টাকা দিচ্ছি, কাল পয়লা বৈশাখ সকলে একটু মিষ্টি মুখ কোরো।"

২৪-০৩-৮৯-তে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন "গোধূলি (পুষ্পরেণু দেবীর পুত্র বাবলুর স্ত্রী)-র অসুস্থতার জন্যে ভাবনা। কাল শুনলাম একটু বমি টমি করেছিল। 'হাম'-এ শরীর খুব গরম হয়। ওসব হতে পারে। সর্বদা ঠান্ডা জিনিস খাওয়া ভাল। ডাব ঘোল ছানার জল এসব তো নিশ্চয় খাচ্ছেই — মৌরী মিশ্রির জল খাওয়াও খুব ভাল। — আর ফাল্গুন চৈত্র মাসে শিঙ্গি মাগুর বা জিওল কোনো মাছ খেতে নেই। মাছেদের এ সময় অসুখ হয়।"

১৩-০৭-৯০-তে লেখা চিঠিতে নিজের অসুস্থতার খবর দিয়ে লিখছেন "আজ প্রায় বারো চো দিন হলো — আর ঠাকুর ঘরে যেতে পারিনি। ওতেই মন বড় খারাপ, কতোদিনে পারবো জানি না।"

১৬-১০-৯৩-এর চিঠিতে লিখছেন "প্রার্থনাতেই মনে বল আসে। গৌরী বাড়ির মা কালীর কবচটির কাজ আস্তে আস্তে হবে বলেইছেন। আর চির করুণাময়ী মা সিদ্ধেশ্বরী তো আছেনই। সর্বদা শরণ করে চলবে।"

০৭-০২-৯৪-এর চিঠিতে লিখেছেন "আগামী ৩ রা ফাল্গুন (১৬-০২-৯৪) তোমার জন্মদিন। সুশান্তর হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ আর এই আশীর্বাদ পত্রটি পাঠাচ্ছি। তিথিটি এমন পড়েছে এবার এমন কখনো বড় হয় না। মাছ ভাত খাবার দিন নয়, শীতল ষষ্ঠি, তাই

একটু দই মিষ্টি খেও .... আর একটি কথা — কোনো সূত্রে একটি দৈব ওষুধ হাতে এসেছে — বাতের ব্যথার পক্ষে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। সেটি তোমার জন্যে পাঠাচ্ছি — সঙ্গে 'নিয়ম পত্র' দেওয়া আছে। সুতোও সঙ্গে দিলাম। যাতে চটপট ধারণ করতে পারো। এখন ঠাকুরের ইচ্ছেয় যেন কাজ হয়। এই সঙ্গে — আর একটি — ছোট্ট জিনিস দিলাম। এটি আসামের জিনিস। একজন অসমীয়া লেখিকা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে উপহার দিয়ে গেছলেন। ওঁদের ভাষায়—এর নাম 'ঠাকুরের আসন'। তুমি এটি তোমার ঠাকুরের চৌকিতে পেতে রেখো। .....

পুনঃ আর একটি কথা—শীতল ষষ্ঠীর পালনীয় গোটা সেদ্ধ পান্তা ভাত নিয়ে চিন্তা কোরো না। সুবিধে অসুবিধেয় — চিড়ে দৈ-ও চলে।"

চিঠির অংশগুলি থেকে আশাপূর্ণাদেবীর মাতৃ হৃদয়ের কল্যাণী রূপের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সামাজিক রীতি-নিয়ম সম্পর্কে কতখানি জ্ঞাত ছিলেন তিনি তারও পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক সমস্ত কুশলতার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে নিজেকে সজাগ রাখতেন।

জীবন যেমন আশাপূর্ণাদেবীকে দিয়েছে অনেক কিছু তেমনি কেড়েও নিয়েছে অনেক। ১৯৪৯ সালে জেষ্ঠপুত্র প্রশান্ত ২২ বছর বয়সে মারা যায়। এ শোক ভোলবার নয়, বলবার নয়। ১৯৭৮ সালে হারান স্বামী কালিদাস গুপ্তকে। ১৯৯৪ সালে পুত্রতুল্য একমাত্র জামাতার মৃত্যু হয়। তার আগে জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রীর অকালমৃত্যুও তাঁকে কম আঘাত দেয় নি। এছাড়াও তিনি হারিয়েছিলেন খুব কাছাকাছি সময়ের ব্যবধানে তাঁর দুই দাদা, চিরকালের সঙ্গী দিদি রত্নমালা ও সখীসমা ছোটবোন সম্পূর্ণাকে। এরও বেশ কিছুকাল আগে সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নী লেখা ও ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ অকালেই মারা যান। জীবনের হাসি-খেলার সঙ্গে শোকও জড়িয়ে থেকেছে এমনিভাবেই।

এই অসামান্য জনপ্রিয় লেখিকা ইংরেজীর ১৩ জুলাই ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলার ২৭ আষাঢ়, ১৪০২) গভীর রাত্রে মারা যান।

ব্যক্তি জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে তাঁর সাহিত্য জীবন। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি সাহিত্য ভুবনে প্রবেশ করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (১৯২২ খ্রীঃ)

'শিশুসাথী' পত্রিকা আয়োজিত এক কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হন আশাপূর্ণাদেবী। তিনি লিখছেন —"দুম করে একটা কবিতা লিখে ফেলে পাঠিয়ে দিলাম একখানা পত্রিকায়। পত্রিকার নাম 'শিশুসাথী'। সাল বাংলা ১৩২৯। কবিতার নাম ছিল 'বাইরের ডাক'। ..... ক'দিন পরেই আমার নামে এসে হাজির সদ্য মাসের একখানি 'শিশুসাথী'। তার মধ্যে ছাপার অক্ষরে জলজল করছে, আমার সেই 'বাইরের ডাক' কবিতাটি।" (পৃষ্ঠা-৩৮/আমার ছেলেবেলা-আশাপূর্ণাদেবী/আর এক আশাপূর্ণা-সংকলক নূপুর গুপ্ত, সুশান্ত কুমার গুপ্ত) সঙ্গে অনুরোধ গল্প পাঠাবার। এই পত্রিকারই পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প 'পাশাপাশি'। অন্যান্য শিশুসাহিত্য পত্রিকা 'মৌচাক', 'রংমশাল', 'খোকাখুকু' থেকেও গল্প পাঠানোর আমন্ত্রণ আসতে থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা মরা মরা থেকে রাম রাম হয়ে ওঠা আর কি, খেলা খেলা থেকে লেখা লেখা। আশাপূর্ণাদেবী শুরু করেছিলেন খেলার ছলে, কিন্তু খেলার ছলে শুরু করেও লেখিকা হয়ে উঠলেন তিনি। তবে ব্যাপারটা যত সহজে বলে ফেলা যায় তত সহজে হয়ে ওঠে না।

কবিতা লেখা বা গল্প লেখা নিশ্চয়ই কোনো অঙ্কের ফর্মুলা নয়, যে ছকে ফেললেই লেখিকা হয়ে যাওয়া স ব। সেই ছবছর বয়স থেকেই সাহিত্য পাঠ শুরু হয়ে গেছে। পড়ছেন অনেক কিছু — রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন দত্ত এবং আরও অনেক। "ধীরে ধীরে মনের মধ্যে তৈরি হয়ে উঠতে থাকে যেন আর একটা জগৎ, উপলি র জগৎ। যেখানে অফুরন্ত অনুভূতির প্রবাহ। যে অনুভূতি কিছুটা বোধের বাইরে কিছুটা যেন বোধের জগতে ধাক্কা মেরে যায়।..... একটা কী করি কী করি ভাব। যেন কিছু একটা না করলেই নয়। এমতাবস্থায় ওই সম্পাদকের প্রতি প্রথম ঢিল নিক্ষেপ।" (পৃষ্ঠা-৭ / খেলা থেকে লেখা / আর এক আশাপূর্ণা) ১৯২৩ সালে 'খোকাখুকু' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় 'স্নেহ'-উপজীব্য কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হন ১৪ বছরের আশাপূর্ণা। কিন্তু পুরস্কার পেতে পেতে তাঁর বয়স পনের পার হয়ে যায়। প্রতিযোগিতার নিয়ম ছিল প্রতিযোগিনীর বয়স ১৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তাই আশাপূর্ণা চিঠি লিখে জানান তিনি প্রথম হলেও তাঁর বয়স পনের পার হয়ে গেছে। সম্পাদক জানালেন তুমি কবিতা লেখার পুরস্কার তো পাবেই, সঙ্গে আর একটা সত্যবাদিতার জন্য। যাই হোক, এরপর পনের বছর বয়সে তো বিবাহ। বিয়ের পর

দু'বছরের মত রচনায় ভাঁটা চলেছে। কলকাতায় চলে আসার পর আবার পূর্ণ উদ্যমে সাহিত্য চর্চা চলে।

এরপর অনেকদিন পর্যন্ত তিনি ছোটদের জন্যই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, "শিশু সাহিত্য নিয়েই থেকেছি। সেই ১৩২৯ থেকে ১৩৪৩ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি ওই ছোটদের জন্যেই।

শুধু অন্তরালে ক্রমেই ভরে উঠেছে কবিতার (অর্থাৎ পদ্যর) খাতা। বাস করছি যেন এক সদা ঝঙ্কৃত ছন্দের জগতে। মিলোচ্ছি অনবরত। প্রেম ট্রেম তো আছেই, তাছাড়া তখন তো আবার মনের মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রবল জোয়ার। তার ফসলও ফলছে। তবে সম্পাদকমশাইদের পরম ভাগ্য যে সে সব আর তাদের দিকে ছুঁড়ে মারিনি।" (পৃষ্ঠা-৭/ঐ) ১৯২২ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বড়দের জন্য লেখা একরকম স্থগিত রাখার কারণ হিসাবে আশাপূর্ণাদেবী বলেছেন "কারণটা যদি এখন বলি তো শুনে সকলেই অট্টহাস্য করে উঠবেন। — তখন মনে হতো — বড়োদের জন্যে লেখা মানেই তো প্রেম ট্রেম অর্থাৎ নরনারী ঘটিত ব্যাপার? তার মানেই তো — আবেগ অস্থিরতা রোমান্টিক সিন-ফিন এসে যাওয়া? সেই বস্তু গুরুজনদের চোখে পড়বে, না বাবা, কাজ নেই। যদিও ততদিনে বিয়ে সাদি হয়ে গিয়ে ঘোরতর সংসারী হয়ে বসে আছি, কিন্তু ওই চক্ষুলজ্জাটা আর কাটতে চাইছে না।" (পৃষ্ঠা-২৩/ঐ) সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে ১৯৩৬ সালে শারদীয় "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় "পত্নী ও প্রেয়সী" নামে বড়দের জন্য প্রথম গল্প লেখেন।

ছোটোদের জন্য লিখেও আশাপূর্ণাদেবী অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি বলেছেন "ছোটদের জন্যে লিখে যে তখনকার ছোটদেরও মনস্তুষ্টি করতে পেরেছিলাম, তার প্রমাণ এখনও পাই, যখন মাঝে মাঝে কোনো সভাক্ষেত্রে প্রায় আমারই সমবয়সী কোনো বৃদ্ধ ভদ্রলোক অথবা বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা একগাল হেসে এগিয়ে এসে বলেন, সেই কোন ছেলেবেলা থেকেই যে আপনার লেখা পড়ছি! কী ভালই লাগত! নাতি নাতনীর জন্যে খুঁজে খুঁজে আপনার 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' কিনে দিয়েছি। আচ্ছা সে বইগুলো এখন আর পাওয়া যায় না? 'হাফ হলিডে', 'রঙিন মলাট'।" (পৃষ্ঠা-৮/ঐ)

বড়দের রচনাতেও তিনি সমান জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। প্রথম গল্প সংকলন ছোটদের জন্য "ছোট ঠাকুরদার কাশী যাত্রা" - র পর তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ বড়দের জন্য "জল আর আগুন"। তাঁর ছোটগল্পগুলির বিষয় বৈচিত্র্য, বক্তব্য বিস্ময়কর। এ ব্যাপারে 'ছিন্নমস্তা', 'ইজ্জত', 'সবদিক বজায় রেখে', 'পরাজিত হৃদয়', 'একটি মৃত্যু ও আর একটি', 'বেআব্রু', 'আয়োজন', 'একটি নির্বোধের স্বীকারোক্তি', 'একান্তই জরুরী' ইত্যাদি অসংখ্য গল্পের নাম করা যায়।

আর উপন্যাসগুলিতে তো বিস্তৃত কিছু লেখার ইচ্ছা। প্রথম উপন্যাস "প্রেম ও প্রয়োজন" লেখারও কিছু ইতিহাস আছে। পরিচিত বন্ধু শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় 'কমলা পাবলিশিং' - এর পক্ষ থেকে একটি উপন্যাস লিখে দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু 'ও আমার দ্বারা হবে না বলে' ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিশুবাবু ছাড়েন না, জোর দিয়ে বলেন, 'শুরু করেই দেখুন না'। অতএব আশাপূর্ণাদেবী শুরু করলেন এবং শেষও করলেন। ১৩৫১ - সালে 'কমলা পাবলিশিং' থেকে প্রকাশিত হল "প্রেম ও প্রয়োজন"। এরপর অসংখ্য অসংখ্য উপন্যাস লিখেছেন, যে উপন্যাসগুলিতে উপজীব্য করেছেন মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনকে। তিনি বলেছেন "আমার বিদ্যার্জনের মননের সঞ্চয় বেশি নয়, আহরণের সুযোগও কম পেয়েছি, তাই চোখে দেখা অভিজ্ঞতা-জগৎ থেকেই আমি গল্প উপন্যাসের তথ্য সংগ্রহ করেছি। ..... কল্পনার চেয়ে অভিজ্ঞতার উপকরণই আমার লেখায় বেশি। ..... জীবন বহির্ভূত কোনো অভিজ্ঞতা আমার সাহিত্যে নেই বললেই হয়, কারণ জানা জগতের বাইরে আমি পা বাড়াইনা।" (পৃষ্ঠা-২১৭/আশাপূর্ণাদেবীর মুখোমুখি - সাক্ষাৎকার অরুণ বসু / ধনধ্যান্যে পত্রিকা, ১ -১৫ মার্চ, ১৯৭৮/উৎসঃ কোরক সাহিত্য পত্রিকা/ঐ) একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, মূল্যবোধের ভাঙন, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন — এসবই তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসগুলি অধিকাংশই পরিবার জীবনের ভারসাম্যচ্যুতি ও অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধীয়।

উদাহরণস্বরূপ "মিত্তিরবাড়ি", "শশীবাবুর সংসার", "ছাড়পত্র", "অতিক্রান্ত", "সমুদ্র নীল আকাশ নীল", "অনবগুণ্ঠিতা", "উত্তর লিপি", ইত্যাদি উপন্যাসের নাম করা যায়। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক স্ত্রী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আশাপূর্ণাদেবীকে সংখ্যাধিক্যে

এবং জীবন পর্যালোচনার বিশিষ্টতায় অগ্রবর্তিনী বলেছেন। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত "মিত্তির বাড়ি" উপন্যাস তাঁকে বড়দের লেখার জগতে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তারপর প্রকাশিত হয় "বলয়গ্রাস" (১৯৪৯ খ্রিঃ) তারপর থেকেই তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত - একথা বলেছেন অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী আশাপূর্ণাদেবীর রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকায়। আর "প্রথম প্রতিশ্রুতি", "সুবর্ণলতা", "বকুল কথা"য় তিনি অতীত, অনতি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে ধরে পাঁচটি প্রজন্মের কাহিনী শুনিয়েছেন। তিনি আত্মজীবনী লেখেন নি। তবে "সুবর্ণলতা"য় এবং "দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে" উপন্যাসে তাঁর সময়ের কিছু ছবি ফুটে উঠেছে। এত লেখা লিখলেও লেখিকা হিসাবে তো অতৃপ্তি কিছু থেকেই যায়, মনে হয় তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন সবটা বোধ হয় পেরেও ওঠেন নি। সেক্ষেত্রে "প্রথম প্রতিশ্রুতি" লিখে কিছুটা তৃপ্তি পেয়েছিলেন বোধ হয়। আর তাঁর সৃষ্ট প্রিয় চরিত্রদের মধ্যে আছে "অতিক্রান্ত" উপন্যাসের পরাশর, যে তার প্রেমিকাকে অকল্যাণের মধ্যে টেনে আনতে পারে নি। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার স্বামীর ঘরে, সুস্থ জীবনের মধ্যে।

আশাপূর্ণাদেবী তাঁর সাড়ে বাহাত্তর বছরের সাহিত্য জীবনে প্রায় দেড় হাজার ছোটগল্প লিখেছেন, লিখেছেন দুশোটির মত উপন্যাস, ছোটদের জন্য সাতাশটি গ্রন্থ। এছাড়াও স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, কবিতা, ফিচার ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়। তাঁর সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন সূচনাগুলিকে চিহ্নিত করে দেওয়া যায় এইভাবে —

১৯২২- সালে তের বছর বয়সে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় "বাইরের ডাক" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে প্রথম নিজের নাম দেখলেন আশাপূর্ণা।

১৯৩৬- সালে ২৮ বছর বয়সে "শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রথম বড়দের গল্প "পত্নী ও প্রেয়সী" প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮- সালে ছোটোদের জন্য তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন "ছোটো ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা" প্রকাশিত হয় আশুতোষ লাইব্রেরী থেকে।

১৯৪০- সালে প্রথম বয়স্ক পাঠ্য গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় "জল আর আগুন" নামে দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং থেকে।

১৯৪৪-এ প্রথম বয়স্ক পাঠ্য উপন্যাস "প্রেম ও প্রয়োজন" প্রকাশিত হয় কমলা পাবলিশিং থেকে।

১৯৫৯- সালে ছোটদের জন্য প্রথম উপন্যাস লেখেন "কনকদীপ"। এটি প্রকাশ করে রাইটার্স সিন্ডিকেট।

১৯৬৪- সালে "অগ্নিপরীক্ষা" নামক উপন্যাসটি প্রথম হিন্দিতে অনূদিত হয়।

১৯৬৭- সালে একটি নাটক প্রকাশিত হয় "মহিলা সমিতি" নামে শারদীয় 'উর্বশী' পত্রিকায়।

১৯৭৬- সালে পান "জ্ঞানপীঠ পুরস্কার"। মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে তিনিই প্রথম এই সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণ করেন।

১৯৪৭- সালে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম বাড়ির বাইরে পা রাখেন আশাপূর্ণাদেবী ৩৮ বছর বয়সে।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের উদ্যোগে 'কথাশিল্প' নামের এক গল্প-সংকলনকে কেন্দ্র করে গল্প-প্রতিযোগিতা আয়োজিত হত। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আশাপূর্ণাদেবী কবি নরেন্দ্র দেবের অনুরোধে। এরপর তাঁর কাছে খুলে যায় বাইরের জগতের এতদিনের বন্ধ দরজা। কেননা, তিনি এতদিন লিখতেন এবং সে লেখা সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন তাঁর স্বামী অথবা দেবর। মাত্র তিনবার ডাক মারফৎ তিনি লেখা পাঠিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন অবরোধেই কাটিয়েছেন। অনেকে তাঁর লেখা পড়ে ভাবতেন এটি কোন লেখিকার ছদ্মনামে লেখকের লেখা। কেননা, এতটা বলিষ্ঠ লেখা লেখিকার দ্বারা স ব নয়। যাই হোক, এতদিনে সে-সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল। এরপর এল সভানেত্রী হবার আমন্ত্রণ। ৪০ বছর বয়সে তিনি শ্রীরামপুরের 'বনফুল' নামক সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত সভায় সভানেত্রী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি বাইরের জীবন এবং পারিবারিক জীবন —উভয়ক্ষেত্রেই দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন সাহিত্যিকের সঙ্গে তার যোগাযোগ তৈরি হতে থাকে। নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, পরিমল গোস্বামী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, মধুসূদন মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সবিতেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক এবং সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে ওঠে।

আশাপূর্ণাদেবী তাঁর সাহিত্য কীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন বহু পুরস্কার। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারগুলি হল —

১৯৫৪ সালে পান "লীলা পুরস্কার" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত)।

১৯৫৯ সালে পান "মতিলাল ঘোষ পুরস্কার" (যুগান্তর পত্রিকা প্রদত্ত)।

১৯৬৩ সালে পান "ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।
১৯৬৬ সালে পান "রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার " (পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রদত্ত)।
১৯৭৬ সালে পান "জ্ঞানপীঠ পুরস্কার" (ভারত সরকার প্রদত্ত) ।
১৯৮৮ সালে পান "হরনাথ ঘোষ পদক" পুরস্কার (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত)।
১৯৮৯ সালে পান "শরৎ পুরস্কার" (শরৎ সমিতি, কলকাতা প্রদত্ত)।

তিনি বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। যে যে সম্মান তিনি পেয়েছেন সেগুলি হল —

১৯৭৬-এ পেয়েছেন ভারত সরকার প্রদত্ত "পদ্মশ্রী সম্মান"। তাঁকে 'সম্মানসূচক ডক্টরেট' (ডি. লিট) অর্পণ করেছে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৭), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৮), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯০)। ১৯৮৯ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে 'দেশিকোত্তম উপাধি'। ১৯৯৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে 'জগত্তারিণী পদক'। ১৯৯৪-এ 'সাহিত্য অকাদেমি ফেলো' (ভারত সরকার) নির্বাচিত হয়েছেন। এই সময়েই পেয়েছেন 'ভুবনেশ্বরী পদক' (শিশু সাহিত্য পরিষদ)। কর্ণাটক সাহিত্য অকাদেমি শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে প্রথম তাঁর জীবনকথা প্রকাশ করে ১৯৯৪-এ। ২০০৪ সালে পঃ বঙ্গ বাংলা অকাদেমি ও ২০০৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি তাঁর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনও অলংকৃত করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন শহরে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'- এর 'বাংলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রী' (১৯৬৪), 'কথা সাহিত্য শাখার সভানেত্রী' (১৯৭২), 'সাহিত্য শাখার সভানেত্রী' (১৯৭৩), 'মূল সভানেত্রী' (১৯৮৯)-র ভূমিকা পালন করেন। P.E.N (Poet, Essayist, Novelist) সংস্থার সহ সভাপতির পদ অলংকৃত করেন ১৯৭৮-এ, পরবর্তী কয়েক বছরও ওই পদে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে যান বিহারের সমস্তিপুরে 'সংযুক্ত বিহার বাংলা সাহিত্য সম্মেলন'-এ। 'তারাশঙ্কর জন্মদিবস উদ্‌যাপক সমিতি'-র আমন্ত্রণে যান তারাশঙ্কর গৃহে, লাভপুরে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'রবিবাসর' নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে মহিলা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। 'বিশ্বভারতী-সংসদ'-এরও সদস্য ছিলেন তিনি।

তাঁর কালজয়ী উপন্যাস "প্রথম প্রতিশ্রুতি" (১৯৬৪), "সুবর্ণলতা" (১৯৬৭), বকুলকথা (১৯৭৪)। "প্রথম প্রতিশ্রুতি"-র জন্যই তিনি পেয়েছেন "রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার"।

এই উপন্যাসের জন্যই তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি। পেয়েছেন 'পদ্মশ্রী' সম্মান ও 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার'। তাঁর বহু উপন্যাস ও গল্প চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে, টিভি-সিরিয়াল হয়েছে, নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ হয়েছে, আবার বিভিন্ন ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে তাঁর রচনাগুলি। বিশেষ করে হিন্দি, অসমিয়া, উর্দু, ওড়িয়া, মারাঠি, মালয়ালম, তামিল, গুজরাটি এবং ইংরেজিতে। এরমধ্যে সর্বাধিক অনুবাদ হিন্দিতে। এ-সবই প্রমাণ করে আশাপূর্ণাদেবীর অসাধারণ জনপ্রিয়তাকে।